অবলম্বন

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

1

অবলম্বন

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

টুকু ধরফর করে উঠে বসল তক্তপোষে। কখন মেঘ করেছে আকাশে টের পায়নি। দাবদাহ চলছে। চৈত্র গেল, বৈশাখের মাঝামাঝি, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। গরমে দিনরাত হাসফাঁস, লু বইছে। দরজা জানালা খোলা রাখার উপায় নেই। গরম বাতাসে গারে জ্বলুনি, প্যাঁচপেচে ঘাম। আর এ-সময় ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে ভাবা যায় না।

টুকু দৌড়ে তক্তপোষ থেকে বারান্দায়, তারপর উঠোনে। তারে মেলা সায়া শাড়ি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় টেনে আবার ঘরে। হাওয়া দিচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়া। টুকুর শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা হাওয়ায়।

তাপরই মনে হল, দুদুমণি কোথায়। ঘর খালি। কুকুরটা বারান্দায় শুয়ে আছে। বৃষ্টি পড়ছে বলেই হয়তো লেজ নাড়তে নাড়তে উঠোনে নেমে গেল। দুদুমণি বাড়ি থাকলে, কুকুরটা বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না। সে থাকলেও। কেউ একজন না থাকলে বাড়িতে কুকুরটাও থাকে না। কুকুরটাও বাড়িতে! দুদুমণি গেল কোথায়।

সে গেলে কুকুরটা পেছনে ল্যাকপ্যাক করে হাঁটে।

দুদুমণি গেলে কুকুরটা পেছনে ল্যাকপ্যাক করে হাঁটে।

সেই কুকুর বাড়িতেই আছে। কুকুরটাই তাদের এখন পাহারাদার। দুদুমণি একা রোদে কোথায় বের হয়ে গেল।

আমগাছতলায় থাকতে পারে। ঝড় উঠবে আশঙ্কায় যদি বুড়ি গাছতলায় ছুটে যায়। আম, জাম, জামরুলের গাছ বাড়িটার চার পাশে। কাঁঠাল গাছও আছে। লেবু সফেদা গাছ, যে দিনের যে ফল দাদু নিজ হাতে লাগিয়ে গেছেন। একটা আম চুরি গেলে দুদুমণির চোপার শেষ থাকে না।

টুকু রেগে গেলে, বুড়ি মরতে গেছে ভাবে। ঝড়ে আম পড়বেই। লোকজন সব তাঁদের তাও তার জানা। ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে থাকারও স্বভাব আছে পাড়ার বাচ্চাকাচ্চাদের। দুপুরে বিকেলে কোথা থেকে যে পঙ্গপালের মতো তারা উড়ে আসে বোঝা দায়। দুদুমণি লাঠি হাতে তাড়া করবে। পারে। একদিকে তাড়া করলে অন্যদিকের ঝোপ থেকে উঠে আসে তারা। না পারলে চেঁচামেচি, ওরে টুকু সব সাফ করে দিল। না পারলে, ওরে নধর সব শেষ করে দিল। কে বেশি বিশ্বাসী তখন বোঝা ভার। সে না নধর। আর নধরও হয়েছে তেমনি, কোথা থেকে লাফিয়ে বের হয়ে আসবে। ছুটে যাবে, ঘেউ ঘেউ করবে। মুহূর্তে গাছপালা সাফ।

আজ তেমন কিছু হলে নধর নিশ্চিন্তে বারান্দায় শুয়ে থাকতে পারত না। দুদুমণি গাছতলায় থাকলে সেও গাছতলায়। ঝুপঝুপ বৃষ্টিতে মুহূর্তে ঘর বাড়ি ঠান্ডা হয়ে গেল।

আকাশে মেঘের ওড়াউড়ি। ঝড়ও উঠে গেল। অথচ দুদুমণির কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

সে দরজা পার হয়ে উত্তরের বারান্দায় গেল। না দুদুমণি নেই।

বারান্দায় ছোট্ট চালাঘর, টালির ছাউনি, মাটির মেঝে, উনুনে কাঠপাতায়, রান্না, দুদুমণির খাওয়া খুব তাড়িয়ে তাড়িয়ে—একবেলা আহার, সহজে পাত থেকে উঠতে চায় না। যদি খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ে, রাগ হলে টুকুর এমনই সব মনে হয়।

সে বারান্দা থেকে অগত্যা নেমে গেল।

বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টিতে ভিজতেও আরাম লাগছে। কিন্তু দুদুমণি গেল কোথায়। তাকে না বলে কোথাও যায় না। অবশ্য যায় না বললে ভুল হবে, এই নগেনের বাড়ি থেকে আসছি বলে, কোথায় কার বাড়ি গিয়ে বসে থাকবে বলা মুশকিল। এক বাড়ি থেকে আরও দশ বাড়ি ঘুরে বেশ বেলা করেই হয়তো ফিরে এল। তারপর দশরকমের কৈফিয়ত দিয়ে এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খাওয়া।

খেতে খেতে গ্লাস নামিয়ে বলা, আমি তো বসে থাকি না দিদি, কাকে দিয়ে কী উদ্ধার হয়, তাই সমরেশের বাড়ি হয়ে এলাম...

টুকু বিরক্ত হলে না বলে পারে না, দয়া করে থামবে বিরজাসুন্দরী। বকর বকর ভালো লাগছে না। কখন রাঁধবে, কখন খাবে। আমি রাঁধলে মুখে রোচে না।

হয়ে যাবে। তুই চান করে দু-বালতি জল তুলে রাখ। পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এলাম বলে।

সে রেগে গেলে দুদুমণি আর দুদুমণি থাকে না, বিরজাসুন্দরী হয়ে যায়।

রাগ হয় না! জোরে হাঁটতে পারে না, কানে শোনে না, চোখে দেখে না ভাল, কোথায় গিয়ে মরে পড়ে থাকবে—এই এক দুশ্চিন্তা তার। রাগ জল হতে অবশ্য সময় লাগে না—কেমন অপরাধী বালিকার মতো তখন কথাবার্তা বিরজাসুন্দরীর।

আমার কী দোষ। নগেনের বউ যে খবরটা দিল।

আবার খবর।

তা দিলে কী করব। ওদেরই বা দোষ কী, ওরা তো জানে তোর জন্য আমার মাথা খারাপ। রাতে ঘুম নাই।

টুকু বুঝতে পারে তখন, হয়ে গেল, সেই এক প্যাচাল সাতকাহন করে বলা, কাকে না ধরেছে তার খবর দেওয়া, কেউ তো মাথা পাতছে না, রাগ করলে হয়।

এই খবরের কথা শুনলেই টুকুর মাথা গরম। আবার মরতে গেছিলো তোমাকে কতবার বলেছি, আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার এক পেট চলে যাবে।

তোর এক পেট, তুই মেয়েমানুষ না। সোমত্ত মেয়ের কখনো এক পেট থাকে। টুকু জানে বিরজাসুন্দরীর মুখে এমনিতেই আগল নেই। সোমত্ত মেয়ের এক পেট মানতেই রাজি না। বিয়ে না হলে মেয়েমানুষ হয়ে কাজ কী।

তুই কি পুরুষমানুষ, তোর এক পেট হবে!

পেট কথাটা কানে বড়ো লাগে। এমন কতরকমের কথা হয়—সে পছন্দ করছে না, বিরজাসুন্দরী হন্যে হয়ে ঘুরুক। তার অপমানের দিকটাও বিরজসুন্দরী বোঝে না। সকালেই কথা কাটাকাটি হয়েছে-মালা-তাবিজের কথাও উঠেছে, কবজ ধারণ করলে, পাত্রপক্ষ আর ফিরে যাবে না। কোথায় কার কাছে খবর পেয়েছে, কিংবা পালন কাকার পরামর্শেও বিরজসুন্দরী যে মাথা মুড়িয়ে আসেনি কে বলবে।

গন্ধর্ব কবচ সোজা কথা না! বিরজাসুন্দরী বিড়বিড় করে নিজেই প্যাচাল শুরু করে দিয়েছিল।

টুকুর আর সহ্য হয়নি।

তাগা তাবিজ পরতে হয় তুমি পরবে। আমার পেছনে লাগবে না বলে দিলাম। তাবিজ গলায় ঝুলিয়ে বসে থাক। দেখতে হয় তোমাকে দেখুক।

তোকে কিছু বলেছি। এতো চোপা।

তবে কাকে বলছ?

নধরকে বলছি। একটা কুকুর সেও বোঝে আমার কষ্ট, তুই বুঝবি কী, তোর কি কোনো ভাবনা আছে! খাস আর ঘুমাস।

টুকু বুঝেছিল, দুদুমণিকে বুঝিয়ে লাভ নেই। যা ভাববে শেষ পর্যন্ত তা করবে। স স্কাল বেলায় কোনো তিক্ততাই সুখের হয় না। বড়োমাসিও বুঝিয়েছে তাকে, মা আমার কী

করবে বল। তোকে কার কাছে রেখে যাবে, এই ভাবনাতে ঘুম নেই চোখে। মার এক কথা, আমি চোখ বুজলে টুকুর কী হবে!

টুকু যে বোঝে না এ-সব তো নয়। ঠিকই বোঝে। পছন্দ হলেও দাবিদাওয়া নিয়ে আটকে যায়। তার হয়ে এই খরচের বহর কেউ নিতে রাজি না। পাসটাস করা ছেলের খাঁইও কম না। সরকারি চাকুরের তো মেলা দাম। তার একটা দুটো পাস থাকলেও না হয় কথা ছিল, তার তো কিছুই নেই। মায়ের মুখ মনে পড়ে না, বাবারও সে দোষ দেয় না, একা মানুষ, সংসার সামলাবে কে? বাবা তার নিজের সংসার, স্ত্রী বাচ্চাকাচ্চা নিয়েই জেরবার। বছরে দু-বছরে তাকে দেখতে এক আধবার চলেও আসে। এই আসাও যে কত গোপনে, সে তার বাবার মুখ দেখলেই টের পায়।

বাবা এলে চোরের মতো বসে থাকে বারান্দায়। বাবা কথা কম বলে—তখন দুদুমণির মুখের কামাই নেই। বাবাকে দেখলে আরও খেপে যায়। সোমত্ত মেয়ে আর কালসাপ সমান, তুমি না তার বাপ, রাতে ঘুমাও কী করে বুঝি না। ভাত হজম হয় কী করে বুঝি না।

টুকু তখন ভারি বিড়ম্বনায় পড়ে যায়।

দুদুমণি তুমি থাকবে?

বিরজাসুন্দরী থামবার পাত্র, আগুনে ঘি পড়ে যাবার মতো ছ্যাঁত করে জ্বলে উঠবে।

থামব। চিতায় উঠে থামব। আলগা সোহাগ দেখাতে কে বলে! কীসের টানে আসে! কর্তব্য অকর্তব্য বলে কথা। আমি হলে মুখ দেখাতে পারতাম না। এ কেমন বাপ, দায় আদায় বোঝে না।

সে না পেরে, বাবাকে সান্তনা দেয়, তুমি কিছু বাবা মনে কর না। দদমণির মাথাটা গেছে। এই নাও গামছা, পুকুরে ডুব দিয়ে এস। দুপুরে খেয়ে যাবে।

বাবা বাধ্য ছেলের মতো উঠে যায়। পুকুর থেকে ডুব দিয়েও আসে। মেয়ের টানে যে আসে বোঝাও যায়। খেতে বসলে, সে পাখার হাওয়াও করে। সে তার সুন্দর কারুকাজ করা আসন পেতে দেয়। ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে জল, দুদুমণি চোপা করে ঠিক, তবে জামাই আদরে যে খেতেও দেয় তাও সে বোঝে।

কুমড়োফুলের বড়া করেছি। আর দুটো নাও।

বাবা কুমড়োফুলের বড়া খেতে ভালোবাসে। গন্ধরাজ লেবু খেতে ভালোবাসে। দুদুমণির এতটুকু কার্পণ্য নেই। জামাইটির কথা ভেবে যে তিনি এক দণ্ড আগে তেতে উঠেছিলেন, যা খুশি মুখে আসে বলে গেছেন, খাওয়ার পাত দেখে মনেই হবে না।

একটু আমের আচার দে তোর বাবাকে।

আর একটুকরো মাছ দে।

মুড়িঘন্ট কেমন হয়েছে?

পায়েসটুকু খাও। তাও যে আস, এই আমার অনেক। সম্পর্ক তো চেষ্টা করলেও মুছে ফেলা যায় না। আমি আর ক-দিন, চেষ্টা তো কম করছি না।

বাবা কোনো কথারই জবাব দেবে না। অপরাধ বোধ সে বোঝে। খোঁড়া মেয়েটার দুর্ভাগ্য তাও বোঝে। চুপচাপ খেয়ে উঠে বাবা আবার বারান্দায় জলচৌকিতে গিয়ে বসলে, দুদুমণিই বলবে, টুকু বিছানাটা করে দে। একটু গড়াগড়ি দাও। বেলা পড়লে রওনা দেবে।

ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি এল, ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি চলেও গেল।

গাছের নীচে ভাঙা ডালপালা, আমের কুশির ছড়াছড়ি—আম ডাঁসা হতে সময় লাগে, হনুমানের উৎপাতে কিছু রাখাও যায় না। মানুষের উৎপাত তো আছেই। গাছে আম ডাঁসা হতে থাকলেই বিরজাসুন্দরী চঞ্চল হয়ে পড়ে। দিবানিদ্রাও যায় না। হাতে লাঠি নিয়ে ঠুকঠুক করে গাছতলায় গিয়ে বসে।

যদি গাছতলায় বসে থাকে। টুকু দরজায় শেকল তুলে দিল।

ঝড় বৃষ্টির মধ্যে গাছতলায় বসে থাকবে। হয় কী করে। তবে বিরজাসুন্দরীর অসাধ্য কর্ম কিছু নেই। ঝড়ে গাছ থেকে আম পড়তেই পারে, ঝড় বৃষ্টিতে ছুটে যেতেও দ্বিধা করবে না। যদি বাগানে ঢুকে বসে থাকে, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে ঠিক। ঝুড়িতে আম তুলেও রাখতে পারে। খোঁজাখুঁজির তো শেষ নেই। ঝোপ জঙ্গলে দু একটা থেকে যদি যায়, ভিজে গিয়েও হাতড়াতে পারে। সহজে গাছতলা থেকে আসার পাত্র যে নয় ভেবেই টুকু ডাকল, দুদুমণি তুমি কোথায়। অবেলায় বৃষ্টিতে ভিজে শরীর খারাপ হবে বোঝো।

কোনো সাড়া নেই।

গাছগুলি সব পর পর দাঁড়িয়ে আছে। টুকু মাথায় সামান্য আঁচল টেনে, উঠোন পার হয়ে কাঁঠাল গাছটার নীচে এসে দাঁড়াল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, গরমের এই বৃষ্টিতে বসুন্ধরা ঠান্ডা। গাছপাতা থেকে টুপটাপ জল পড়ছে। দু-তিন বিঘে জমি জুড়ে বাঁশঝাড়, ফলের গাছগাছালি, হলুদের জমি সবই ঠান্ডা মেরে গেছে। কিন্তু গাছতলায় দদমণি নেই। ভাঙা ডালপালার ছড়াছড়ি। ঝড়টা জোর হয়েছে ঘুমের মধ্যে টের পায়নি। কিংবা তার মনে হয় সে জেগেই ছিল, সে তো বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে সায়া সেমিজ শাড়ি তুলে নিয়ে ঘরে রেখেছে, ঝড় প্রবল হলে সে টের পেত। কিংবা ঝড় শুকনো ডালপালা খসিয়ে উড়ে গেছে, তারপর ঝুপঝাপ বৃষ্টির শুরু। টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটায় মনোরম শব্দ শুনেই হয়তো তার ঘুম ভেঙে গেছে।

গাছতলায় দুদুমণি নেই। বাঁশঝাড়ের দিকেও গেল, বাড়িটার সঙ্গে বিরজাসুন্দরীর এতো ভাব যে কখন কোথায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে বলা যায় না। অবলম্বন বলতে, সে আর এই বাড়ির গাছপালা। পাতা থেকে শুকনো ডাল সবই বড় দরকারি—সবই জড় করে রাখা স্বভাব। কোথায় কী জড় করছে কে জানে। পুকুরপাড়ের দিকটায় যদি থাকে। নারকেল গাছগুলি দুদুমণির চিরশত্রু। কচিকাচা ডাবও গাছে রাখা যায় না। কে যে কখন সব চুরি করে নিয়ে যায়। এই গাছগুলি নিয়ে বিরজাসুন্দরী ঝড় ফাঁপড়ে আছে।

না নেই। সব ফেলে, না বলে না করে উধাও।

কী যে করে!

ফের বারান্দায় উঠে দরজায় শেকল খুলে টুকু ভিতরে ঢুকল। তারপর রান্নাঘরে ঢুকে অবাক। বিরজাসুন্দরীর সাদা পাথরের রেকাবিতে ভাত, কালো পাথরের বাটিতে ডাল, ভাজাভুজি যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। কিছু মুখে দেয়নি।

টুকুর বুকটা ছাঁত করে উঠল।

না খেয়ে বের হয়ে গেছে!

কোথায় যেতে পারে? তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল—ঠিক আবার কোনো ধান্দাবাজের পাল্লায় পড়ে গেছে। ঘটক সেজে সবাই উপকার করতে আসে।

তা ঠাইনদি, পাত্র বড়োই সুপাত্র। আপনার টুকুকে একবার দেখতে চায়। বলেন তো পাত্রের বাবা মাকে আসতে বলি।

তখন বুড়ির যে কী হয়! সাপের পাঁচ পা দেখে। এরা যে টাকা হাতড়াবার তালে থাকে কিছুতেই বিরজাসুন্দরীকে বোঝানো যাবে না। গাড়ি ভাড়ার নাম করে পালান কাকাই কতবার টাকা নিয়ে গেল। ঠিকমতো দুধ জোটে না, কৃপন স্বভাবের বিরজাসুন্দরী ফোকলা দাঁতে হাসিটি জুড়ে দিয়ে বলবে, যার কেউ নেই, তার ভগমান আছে, তোরা আমার ভগমান।

এখন যে আর এক ভগমানের পাল্লায় পড়ে গেছে টুকুর বুঝতে অসুবিধা হয়। না।

গন্ধর্ব কবচ। সকালেই একবার বিড়বিড় করে বকেছে, হাতে গলায় যেখানেই হোক তিথি নক্ষত্র দেখে ধারণ করতে হবে। আজই সেই তিথি নক্ষত্রের সময় যদি উপস্থিত হয়, কে জানে তারই টানে বের হয়ে গেল কি না।

যা খুশি করুক।

কিন্তু টুকু যাই বলুক, তারই হয়েছে জ্বালা। বড়োমামা মাসেহারা পাঠিয়ে খালাস। মাসের এক তারিখও পার হয় না, রাস্তায় গিয়ে বসে থাকবে। পিওন সুবলসখা যদি সাইকেলে যায়। রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে বলবে, খোকার টাকা হয়েছে?

রোজ রোজ কে আর জবাব দেয়, জবাব না দিলেই মাথা গরম বিরজাসুন্দরীর। —তোর বাপের টাকা, বাপ ঠাকুরদার চোদ্দোগুষ্টির উদ্ধার। তারপর টুকুকে ভিজা গলায় বলবে, যা না পোস্টঅফিসে, সাইকেলে যেতে কতক্ষণ। দীনুকে বলবি মাসের আট তারিখ, মানি অর্ডারের নাম গন্ধ নেই।

তখনই বিরাম মাঝির বাউন্ডুলে ছেলে শরদিন্দুকে দেখে টুকু অবাক। টুকু বারান্দা থেকে মুখ বার করে দেখল, শরদিন্দুই। সবাই বলে খ্যাপা। সে ভাবে বাউন্ডুলে। লোকে খ্যাপা বললে তার রাগ হয়। লোকের কী দোষ, বাপই বলে বেড়ায়, মাথা খারাপ, ছেড়া ফাটা জামা কাপড় পড়ে বেড়ায়, আমার কীসের অভাব! মাথার দোষ না হলে কেউ এ-ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। নিখোঁজ ছিল কতদিন। মাঝে মাঝেই নিখোঁজ হয়ে যায়। আগে থানা পুলিশ, ঘুরাঘুরি শেষ ছিল না। এখন সব হয়ে গেছে। দুদুমণি খোঁজ খবর নিতে

গেলে এক বাক্যে সারা—পুত্র আমার পর্যটনে বের হয়েছে ঠাইনদি। পর্যটন ফেরে বাড়ি ফিরবে।

এবারে পর্যটন সেরে ফিরে এলে বিয়ে দিয়ে দাও। ঘর বাড়িতে শেকড় না গজালে থাকবে কেন! মন উড়উড়। তোমারও তো এই বয়েসটা ছিল, বোঝো না কষ্টটা কীসের।

সব বুঝি ঠাইনদি। তবে দেবেটা কে। একখানা কলসি সঙ্গে দিলে সুবিধে হয়। পুত্র আমার মূত্রের সমান ঠাইনদি। কিছু আর ভাবি না। যা আছে কপালে হবে।

এ-কথা বলতে নাই। দশটা না পাঁচটা, এক ব্যাটা তোমার। মুখে আগুন দিতেও লাগবে। কবিরাজ দেখাচ্ছিলে না।

ও নিজেই ধন্বন্তরী, বলে কিনা, সব উজাড় হয়ে গেছে, কিছু নেই, ধাপ্পা, লোক ঠকানো ব্যাবসা। আনারসের ডিগ চিবিয়ে খাচ্ছে—সঞ্জিবনী সুধা পান করছে ভাবে। ঘরে ক-দিন মানুষ থাকে—ঘর তার ভালো লাগে না। মা জননী চোখের জল ফেললে এক কথা, জগজ্জননী বৃহৎ ব্যাপার। মহাবিশ্ব নিয়ে তার কারবার ঠাইনদি। লেখাপড়াই ব্যাটার কাল বুঝলেন ঠাইনদি। আপনার বউমারে কত বুঝিয়েছি, দ্যাখো আমি মুদির ব্যাটা, নম নম করে আতপ চাউল ছিটাতে জানলেই হয়, বেশি বিদ্যার দরকার নাই। শুনল না, শহরে পাঠাল দিগগজ করতে, নে এবারে বোঝ–মাথায় কাকের বাসা নিয়ে হাজির। যখন তখন ডিম পাড়ছে আর এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে। সাধ্য কী আটকায়।

দুদুমণির কার সঙ্গে কী কথা হয় বাড়ি ফিরে বলা চাই। শরাটা আবার পাগল হয়ে গেছে টুকি। বাড়ি থেকে পালিয়েছে—বিরাম বাজারে যাবার সময় বলে গেল, টুকুর কাছে যদি

যায়, খবর দিতেন। সে তো কবেকার কথা। মাসখানেক হয়ে গেল। শরা দেশান্তরী হয়েছিল, ফিরে এসেছে তবে।

এদিকেই আসছে। বাড়ি ঢোকার রাস্তা থেকেই চিৎকার করছে, জয় টুকুদির। কতদিন তোমাকে দেখি না টুকুদি। থাকতে পারলাম না। ভাবলাম যাই দেখি, টুকুদির হাতের যশ দেখি। ওই যে তুমি কাঁথায় চন্দ্র সূর্য নামিয়ে আনবে বলেছিল, সেই বল কাল। চন্দ্র সূর্য নামাতে পারলে!

টুকুর সূচিশিল্পে যশ আছে। সুচসুতোর মধ্যে প্রাণের রস সঞ্চার না করতে পারলে এমন ছবি নাকি ফুটে ওঠে না। দু-দুবার তার হাতের কাজ প্রদর্শনীতে প্রাইজ পেয়েছে। নকশি কাঁথার বাজার আছে এমনও শুনেছে সে। কাঁথার ফুল ফল গাছের ছায়া আকাশ এবং চন্দ্র সূর্য নিয়ে পড়ে আছে শরার কথাতেই। কত খবর রাখে, তা ঘোরাঘুরি করলে খবর না রেখেই বা উপায় কী!

শরাই কলেজ একজিবিশনে প্রায় জোরদার করেই দুটো তার হাতের কাজ নিয়ে যায়। শরা জোরজার না করলে হত না। শরা এক সকালে এসে ডেকেছিল, টুকুদি আছ?

কে?

আমি শরা টুকুদি।

তুমি কোথার? ঘরের ভিতর টুকু ঝাঁট দিচ্ছিল। সে ঝাঁটা হাতে নিয়ে উঁকি দিলে বলেছিল, ও বাবা হাতে ঝাঁটা, ঝাঁটাপেটা করবে! কী দোষ করেছি!

তোর আজ কলেজ নেই।

কলেজেই যাচ্ছি। কলেজ কম্পাউন্ডে মেলা বসবে। বই-এর মেলা—সঙ্গে হস্তশিল্প। ভাবলাম টুকুদির কাছ থেকে দুটো হস্তশিল্প নিয়ে যাই—চোখ ধাঁধিয়ে দেই।

হয়েছে থাক। বোস।

সাইকেল থেকে নামাল না পর্যন্ত।

কই দেখি।

পাগলামি করবি না।

আচ্ছা তুমি কী টুকুদি! আমি তোমার সঙ্গে মিছে কথা বলতে পারি! ঘরে পড়ে থাকলে কে মর্ম বোঝে। দেখই না দিয়ে।

না কিছু হয়নি। তুই যা।

কেন ওই যে দুটা ময়ূর উড়ে যাচ্ছে, ওটা দাও। আর পাহাড় ঝরনা নদী আছে যেটায় ওটা দাও।

বোকার মতো কথা বলবি না তো! বাড়ি বসে থাকি, কিছু নিয়ে থাকতে হয়। দুদুমণির মতো তোরও দেখছি আমার সবকিছুতেই যশ খুঁজে পাস।

যশ না থাকলে কে কার প্রশংসা করে! দাও তো। আমার সময় নেই। মেলা কাজ। আমরা আর্টসের ছাত্ররা স্টল নিয়েছি আলাদা। ওখানে বাঁধিয়ে রাখব। লোকে আমার

টুকুদির কাজ দেখে ভিড়মি খাবে—কী আনন্দ। দেরি কর না টুকুদি। ঝাঁটা ফেলে শিল্পটুকু দাও তোমার।

এরপর আর পারে!

নে নিয়ে যা। হারবি না কিন্তু। হারালে দুদুমণির চোপার চোটে ভূত পালাবে বলে দিলাম। যা মুখ!

বড়ো ছেলেমানুষী স্বভাব শরদিন্দুর। বয়সে তার বয়সিও না, বড়ই হবে, অথচ সেই ছেলেবেলা থেকেই টুকুদি টুকুদি করে। আর সে বামুনের নাতিন বলে হেয় জ্ঞান করার স্বভাব আছে তার। মাঝির বেটা কলেজে পড়ে এটাও হেয় জ্ঞানের কারণ হতে পারে। অথবা কিছুই হয়তো নয়, অভ্যাস, কেউ যদি দিদি দিদি করে আনন্দ পায় সে বাধা দেবার কে?

শরার এখন সাইকেলখানা কোথায় টুকু জানে না। এমন সুন্দর ছেলেটার মাথা খারাপ ভাবতেও খারাপ লাগে। না ভেবেও উপায় নেই, কলেজ কবেই ছেড়ে দিয়েছে। বই পড়ে, তবে ভারী ভারী বই। এই সব বইই নাকি তার মগজে ঘুণপোকা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার এক কথা, টুকুদি, এই মহাবিশ্বটি বড়ো আজব কারখানা। ভাবলে মাথা ঘোরায়। কত আজগুবি কথাও যে শরা বলে।

উঠোনে দাঁড়িয়েই শরা এদিক ওদিক চুপি দিল। কেউ নেই। গেল কোথায়! সে ফের ডাকল, গেলে কোথায় টুকুদি, তোমার জয় দিলাম। মুখখানাও দেখলাম বারান্দায়, তারপর কোথায় অদৃশ্য হয়ে আছ।

সে সাড়া দিল না।

দুদুমণি না খেয়ে না বলে কোথায় চলে গেছে, খারাপ লাগে না! সে যে গলার কাঁটা দুদুমণির তাও বোঝে। তাই বলে গন্ধর্ব কবচ, হয়! মানুষের বিবেক সাফ না থাকলে কিছু হয় না। বিবেক সাফ থাকলে কি শেষে শরা হয়ে যেতে হয়।

টুকুদি তোমার আবার জয় দিচ্ছি। একবার বের হও না। কতদিন পর এলাম, একবার ঝলমলে দেবী মুখখানা দেখি। আরে বাবা, গাছে তোমাদের কত আম। ওই গাছটা কথা বলতে পারে। গাছে রাশি রাশি আম ঝুলছে, কাঠবিড়ালি উঁকি দিয়ে আছে। কাক শালিখ উড়ে আসছে—তাজ্জব ব্যাপার, আর গ্রহপুঞ্জ ঘুরছে টুকুদি। একটা ফলের মতো ঝুলে আছে, ঘুরছে ঘুরছে। ছবিটা ভারি মজার না টুকুদি। চন্দ্রসূর্য নামল?

না বের হলে রক্ষা নেই। সারাক্ষণ উঠোনে দাঁড়িয়েই বকবক করবে।

বের হয়ে টুকু বলল, কবে ফিরলি? মন ভালো নেই, বকবক করিস না, বাড়ি যা।

চন্দ্র সূর্য নামল!

কাঁথার নকশাতে চন্দ্র সূর্য চায়—গাছপালা, ফল ফুল পাখি চায় শরা। খোঁজ নিতে এসেছে, কাঁথাখানায় কাজ শেষ, না বাকি আছে। সে দেখতে চায়। মন কেমন নরম হয়ে গেল টুকুর বলল, বোস।

বলে টুকু একখানা জলচৌকি এগিয়ে দিল।

ঠাইনদিকে দেখছি না।

কোথায় গ্যাছে। মুখে কিছু দিল না, ঘুম থেকে উঠে দেখি নেই। চা খাবি।

দাও। লিকার দেবে। দুধ দেবে না।

কোথায় ছিলি এতদিন।

কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা সব ঘুরে এলাম। পৃথিবীটা একটা মস্ত ব্যাপার, অতি ক্ষুদ্র অণু তবে এমনিতে কিছু বোঝা যায় না। ব্রহ্মাণ্ড বোঝ? ব্রহ্মাণ্ড রোজ লক্ষ কোটি আন্ডা দিচ্ছে জানো। কুম্ভীচক্রে ঘুরছে। কত লক্ষ কোটি বিশ্ব নিয়ে মহাবিশ্ব ভাবলে মাথা খারাপ।

মাথা খারাপের আর কাজ নেই। বাড়ি যা।

চা খাই। কতদিন পর এলাম। তোমার কাছে বসতে ইচ্ছে করছে। তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন।

টুকু খড়কুটো জ্বেলে আলগা উনুনে চা করল, দু-কাপ চা, এক কাপ শরাকে দিতে গেল বারান্দায়। শরা নেই।

এই গেলি কোথায়!

এই এখানে দিদি। আমগাছতলায় দাঁড়িয়ে সাড়া দিচ্ছে।

চা ঠান্ডা হয়ে যাবে।

শরার এই এক দোষ। বাড়িটার এলে যেতে চায় না। গাছপালার ছায়ায় ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। এতটা জমি ফুলের বাগান বাঁশঝাড় নিয়ে বাড়িঘর কম মানুষেরই আছে। জমি কেউ রাখছে না—বেশি দরদামে জমি বেচে দিচ্ছে। বড়োমামা বাপের জমি বেচে

দিতে রাজি না। চলে যখন যাচ্ছে, জমি ভাগ করে কী হবে। ছোটোমামা মেজমামা গাইগুই করলে কী হবে, তাঁর এক কথা। মা বেঁচে থাকতে জমি ভাগ হবে না। জমি বন্টননামা না হলে যা হয়, পড়ে আছে— দুদুমণির রাজত্বে কেউ বড়োমামার ভয়ে হাত দিতে সাহস পাচ্ছে না। এতে বিরজাসুন্দরীর তেজ আরও বাড়ছে।

না খেয়ে কোথায় বের হয়ে গেলেন!

শরা এখন না এলেই যেন ভালো ছিল। মিল খোলা থাকলে বেলার আন্দাজ মাথায় থাকে। বন্ধ বলে মিলের ভোঁ বাজে না। হাতঘড়িটা তপনকাকার দোকানে পড়ে আছে। খুবই স্লো যাচ্ছে ঘড়ি। কটা বাজে বুঝতে পারছে না। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় বেশ ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছিল। সাইকেল বের করে একবার বড়ো মাসিকে খবরটা দেওয়া দরকার। বাড়ি খালি রেখেই তাকে যেতে হয়। নধর অবশ্য বারান্দায় শুয়ে থাকবে। বলে গেলেই হল, আমি আসছি। বিরজাসুন্দরী কোথায় না খেয়ে বের হয়ে গেল, মাসিকে খবরটা দিতে হয়। সারমেয়টি খুবই অনুগত—কী করে যে সব বোঝে! বের হবে ঠিক করছিল, শরা এসে হাজির। কী করে যায়।

টুকুদি তোমার বিয়ের কিছু হল! শরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কথাটা বলে ফেলল। শুরা সবই জানে, বিরজাসুন্দরী তাকে নিয়ে আতান্তরে আছে, তাও জানে, মাঝে মাঝে এই প্রশ্নটা প্রতিবেশীরাও কেন যে করে ফেলে। আগে চেঁচামেচি করা, বিয়ের কথা বললে গা জ্বলে যাবারই কথা। তাকে নিয়ে সবাই মজা করছে ভাবত, শরাও বলত, শরার কথায় রাগ করতে পারত না। শরাকে খুব ব্যাকুল দেখাত। সামান্য খুঁত আছে শরীরে। তাই বলে কী মেয়েদের বিয়ে হয় না!

চা-এর কাপ নামিয়ে কী ভেবে টুকু থামল। খুব গরম চা। খেতে তার খারাপ লাগে। তাড়াতাড়ি থাকলে প্লেটে ঢেলে খায়। এখন তাড়াহুড়ো নেই, কতদিন পর শরা এসেছে। তার ভালোই লাগছিল। দেশ বিদেশ ঘুরে এলে দাড়ি গজিয়ে যায়। প্যান্ট সার্ট নোংরা হয়ে যায়। ছেড়া তালিমারা প্যান্ট পরেও চলে আসে। বোধহয় সে এখন বাড়িতেই আছে। চুল শ্যাম্পু করেছে। গোঁফ রেখেছে। মুখে চোখে সরল বালকের মতো মনে হয় দেখলে। টুকু যা বলবে তাই বিশ্বাস করবে।

তুমি হাসলে যে টুকুদি।

হাসব না। আমার কবেই বিয়ে হয়ে গেছে। তুই খবরই রাখিস না। তুই এতো বোকা।

বিয়ে।

হ্যাঁ বিয়ে।

কার সঙ্গে।

গাছের সঙ্গে।

গাছের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা কী ভালো টুকুদি।

ভালো মন্দ বুঝি না। তুই আর কোনোদিন বলবি না, টুকুদি তোমার বিয়ের কী হল! কী ঠিক তো!

শরা কী ভাবল কে জানে। সে উঠে পড়ল। গাছের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সে ক্ষুন্ন হয়েছে, অন্তত টুকু শরার মুখ দেখে এমনই ভাবল।

আমি যাই। নীলুমাসির খবর কি! আসে?

আসে।

সুধাদি চলে গেছে?

সুধাদি প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারনি। কোনো খবরই রাখিস না। সুধার বর তাকে ফেলে চলে গেছে।

সুধাদিকে বল, আমি ফিরে এসেছি। কোথাও আর এখন যাচ্ছি না। তোমার নকশিকাঁথায় চন্দ্র সূর্য নামলে আসব।

বোস। এখন যাবি না। একবারে নরেন সাধুর কাছে ঘুরে আয়। মনে হয় বিরজাসুন্দরী সেখানে গিয়ে বসে আছে। আমার সাইকেলটা নিয়ে চলে যা। না গেলে মাসিকে খবর দিতে হবে। বিরজাসুন্দরী ধনুরাঙা পণ, কিছুতেই ঘরের খুঁটি করে রাখবে না। আমাকে তাড়াবে।

কোথায় তাড়াবে।

কী জানি। যা, বসে থাকিস না।

বড়ো অনুগত শরা। সে সাইকেল বের করে বিরজাসুন্দরীর খোঁজে বের হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নধরও সাইকেলের পেছনে ছুটতে থাকলে, শরা ডাকল, টুকুদি দ্যাখ তোমার নধর আমার পিছু নিয়েছে। ঘেউ ঘেউ করছে। তোমার সাইকেল ধরেছি বলে রাগ করছে।

টুকু ডাকল, নধর এদিকে আর। শরা সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে না। এক্ষুনি ফিরে আসবে। আয় বলছি।

নধর এক লাফে বারান্দায় উঠে পায়ের তলায় শুয়ে লেজ নাড়তে থাকলে টুকুর চোখে জল এসে গেল।

দুদুমণি না খেয়ে কোথায় বের হয়ে গেল।

বড়মামা লিখেছে, টুকু কিছু করুক। এত দাবিদাওয়া—দেবে কোত্থেকে। আমার ঘাড়েও তো তিন তিনটি মেয়ে।

কিছু করুক। কী করবে বুঝতে পারছে না। সকালে কটা বাচ্চা বাড়িতে এসে পড়ে যায়। অজ আম ইট-অ পড়ায়। ক খ লিখতে শেখায়নামতা পড়ায়। মাত্র পাঁচ টাকা করে পায়। এতে তার ত্রিশ টাকা উপার্জন হয়। তারপর আর কি করা যায়—সে সাইকেলে মাসির বাড়ি যাবার সময়, অথবা শহরে যদি যায়, চারপাশের লোকজন দেখে—কেউ বসে নেই। সে কোনোদিন ভাবে বড়ো রাস্তায় মোড়ের মাথায় চায়ের দোকান দিলে কেমন হয়। বিরজাসুন্দরীকে কথাটা বলতেই, কী চোপাচায়ের দোকান দিবি! কী বললি, তুই, মজুমদারের নাতনি চা-এর দোকান দিয়েছে! মান সম্মান তুই বুঝবি না। তোর মামারা

জানতে পারলে আগুন জ্বলে যাবে। তাদের বাড়ির মেয়ে চায়ের দোকান দিয়েছে রাস্তায়! শেষে তুই আরও কি দোকান খুলে বসবি কে জানে।

আরও কী দোকান খুলে বসবি কথাটাতে কত কুৎসিত ইঙ্গিত দুদুমণি বোঝে না। চায়ের দোকান, এই যেমন, তার যা সামান্য টাকা আছে, টালির চাল, বাঁশের বেড়া, দুটো টুল, একটা কেটলি, কিছু গ্লাস আর একটা বড়ো মাটির হাঁড়ি, গামলা–হয়ে যাবে মনে হয়েছিল। একটা স্বপ্ন। তার কাঁথাখানার কাজ শেষ হলে আরও কিছু পয়সা আসবে। শরাই মাধববাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। শহরে হস্তশিল্পের একটি দোকান আছে তার। ভালো দামই দেবে। তবে বড়ো সময় লাগে, দিনরাত স্বপ্ন না দেখলে নকশি কাঁথার চন্দ্র সূর্য নামে না। করে যে শেষ হবে, কবে যে নামবে, কখনো জ্যোৎস্না রাতে উঠোনে নকশিকাঁথাখান মাদুরে বিছিয়ে বসে থাকে।

বাড়ি থেকে বিশেষ বেরও হতে পারে না। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে বলে মানুষের নজর বড়ো বিপাকে ফেলে দেয়। সে হেঁটে গেলে—এতো কী দেখার আছে বোঝে না। হাঁটাহাঁটি যেটুকু পাড়ার মধ্যে। পাড়া থেকে বের হলে সাইকেল, পরিচিত কেউ ডাকলে, সে মাটিতে এক পা রেখে সাইকেলে বসেই কথা বলে। কত উড়ো কথা কানে আসে, অপরিচিত যুবকদের চোখ তাঁর খুঁড়িয়ে হাঁটার মধ্যে আনন্দ খোঁজে। সেটা যে কী সে ভালোই বোঝে।

মাসির বাড়িতে বড়ো আয়নায় তার খুঁড়িয়ে হাঁটার মধ্যে কোনো যৌনতার ছবি থাকে কিনা সে সুযোগ পেলেই খুঁজে দেখে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজেকে দেখে। তার পেছনটা বড়ো বেশি দোল খায়। এমনিতে সে স্থূলকায় নয়, শরীরের গড়ন খুবই তার মজবুত।

ঈশ্বর তাকে লাবণ্য এবং সুষমা দুইই দিয়েছেন। খুঁড়িয়ে হাঁটার জন্য পেছনটা তার একটু বেশি ওঠানামা করে। মানুষের লুব্ধ দৃষ্টি তার দিকে এতো কেন তাও বোঝে।

দোকানের কথাতে বিরজাসুন্দরীর একদিন কী চোপা! চায়ের নেশা না ছাই, তোর নেশাতেই দোকানে ভিড় বাড়বে। এটা বিরজাসুন্দরী দশভাতারির মতো ভাবে। নাতনি দশভাতারি হলে বিরজাসুন্দরীর মরণ। গলার ফাঁস।

বিরজাসুন্দরী কেন, মামাদেরও চটাতে সে সাহস পায় না। তার সমবয়সিরা কেউ বসে নেই। সবাই স্বামীর ঘর করছে। তারা বেড়াতে এসে খোঁজখবরও নেয়। কোলে কাঁখে বাচ্চা থাকে। স্বামীর এলেম কত কোলে কাঁখে বাচ্চা নিয়ে এসে দেখিয়ে যায়।

বিরজাসুন্দরী মনে মনে তখন খুবই অপ্রসন্ন। আমার টুকুর বিয়ে হচ্ছে না, তোরা শরীর খালি করে মরদ নিয়ে পড়ে আছিস, টুকুর কি আমার শরীর নাই।

তারও খারাপ যে লাগে না তা নয়। তার তো একজন পুরুষ সত্যি দরকার। সে কাকে অবলম্বন করে বাঁচবে। তার শরীর এতো মজবুত, যে রোগ বালাই পর্যন্ত নেই। শরীরে রোগ ভোগ থাকলেও কিছু নিয়ে সে থাকতে পারত। কত রাতে যে তার ঘুম হয় না। এ-পাশ ওপাশ করে। উঠে জল খায়। বিরজাসুন্দরী ঠিক টের পায়।

সে রাতে উঠলেই টের পায় বিরজাসুন্দরী জেগে আছে।

বাইরে যাবি।

না।

উঠলি যে।

জল খাব।

দুগগা দুগগা।

জল খাওয়ার সঙ্গে দুগগা দুগগা বলার কি আছে টুকু বোঝে না। পরে ভেবে দেখেছে, দুদুমণি টের পায়—এই জলতেষ্টা কেন। এতো রাতেও টুকু না ঘুমিয়ে থাকে কেন। জল তেষ্টা পায় কেন!

সকালে উঠেই টুকু দেখতে পায়, দুদুমণি পাটভাঙা সাদা থান পরে, নামাবলি গায়ে দিয়ে কোথায় বের হচ্ছেন।

কী হল, সাত সকালে কোথায় যাচ্ছ।

যাচ্ছি মরতে।

কোথায় কার কাছে মরতে যাচ্ছ বলে যাবে না।

না, বলে যাব না।

বলে গেলে, দেখবে এসে আমিও বাড়ি নেই।

বুড়ি জব্দ।

হরতুকির কৌটাটা আবার রাখলাম কোথায়। টুকুদিদি, খুঁজে দে না। আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি। কোথাও বের হলেই তুই এতো ফোঁস করিস কেন। আমিতো চেষ্টা করছি।

না আর চেষ্টা করতে হবে না। বের হবে না। তোমার জন্য মুখ দেখাতে পারি না। কী রে তোর দুদুমণি সকালে উঠেই কোথায় বের হল। যা গরম পড়েছে—কী রোদ, ছাতা মাথায় কোথায় যাবে! তোর দুদুমণির গোরু খোঁজা চলছে, কবে যে শেষ হবে।

এটা যে প্রতিবেশীদের কটাক্ষ, দুদুমণি কিছুতেই বোঝে না। দুদুমণি শুনতে পেলে বলবে, তা মা যা বলেছ, গোরু খোঁজাই সার, পাচ্ছি না। এসব কথা শুনলে তার সত্যি মরে যেতে ইচ্ছে হয়।

সুধার বাবা যে যেতে বলল!

বলুকগে।

বিরজাসুন্দরী অগত্যা সেদিন বারান্দায় বসে পড়েছিল। কিছুটা সান্ত্বনা দেবার মতো যেন বলা, আরে বিবাহ কী সহজ কথা, সাত মন ঘি না পুড়লে পাকা কথা হয় না। বিধির নির্বন্ধ, তাই বলে তো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না, কপালের নাম গোপাল তাও বুঝি—যখন হবার ঠিকই হবে, তবে মন যে মানে না।

তুমি যাবে না সোজা বলে দিলাম। অনেক বিভ্রাট বাধিয়েছ, লোক হাসিয়েছ। সুধার বাবা উদ্ধার না করলেও চলবে।

লোক হাসালাম! কবে?

হাসালে না, যাকে রাস্তার দ্যাখ তার কাছেই বলবে, তোরা আমার ভগবান। কাকে না বলেছ, পালান কাকা, অধীর কর্মকার, মানিক দাস কে না সুযোগ বুঝে তোমার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। আমাকে তুমি কী ভাব। যাবে না বলে দিলাম—এক কথা।

আমার অন্য কাজ আছে। তোর জন্য ভাবতে আমার বয়েই গেছে।

কী কাজ বল, আমি করে দিচ্ছি। কাকে খবর দিতে হবে বল, ডেকে নিয়ে আসছি। তুমি আমার পাত্রের খোঁজে এক পা বাড়ি থেকে বাড়িয়েছ তো, আমার মরা মুখ দেখবে।

তখনই বুড়ির কী কান্না। তুই কী বললি টুকু, মরা মুখ, তোর মা নেই, আমার কেউ নেই, থাকলে তুই এতো বড়ো কথা বলতে পারতিস। তাপরই ঘরে ঢুকে গায়ের নামাবলি তক্তাপোষে ফেলে দিয়ে একেবারে নিরাসক্ত গলায় কথাবার্তা, আমার কী, এতো যার মান, তাকে বিয়েটা করবে কে! দু-দিন বাদে ফেরত দিয়ে যাবে।

সেই থেকে অনেকদিন চুপচাপই ছিল। কোথাও বের হত না। আজ কী হল কে জানে, আবার বের হয়ে পড়েছে।

কুকুরটার দিকে টুকুর চোখ গেল।

বেইমান।

দু-জনে ঠিক শলাপরামর্শ করেই বের হয়েছে। না হলে, নিশ্চিন্তে নধর বারান্দায় শুয়ে থাকতে পারে।

এই কোথায় গেছে দুদুমণি?

লেজ নাড়ছে। একবার চোখ তুলে তাকে দেখল। আবার মুখ গুঁজে দিল পেটের দিকে।

তোমার আরাম বের করছি।

বলেই টুকু তাড়া লাগাল কুকুরটাকে। কুকুরটা লাফ মেরে উঠোনে নেমে গেল।

বের হ। যেদিকে চোখ যায় চলে যা। দুদুমণি গেছে, তুইও যা। থেকে কী হবে!

তখনই শরা সাইকেল চালিয়ে সোজা উঠোনে ঢুকে গেল।

গেছে?

নরেন সাধুর কাছে গেছে।

শরা সাইকেল থেকে লাফিয়ে নামল। তারপর বলল, এক গ্লাস জল দাও টুকুদিদি। নরেন সাধুর থানে মচ্ছব। ঠাইনদি পর্যন্ত খাটছে।

টুকুর মাথা গরম হয়ে গেল। দণ্ডি খাটছে এই বয়সে। বুড়ি মরবে। কুলো মাথায় রোদে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে সারাদিন মন্দির প্রদক্ষিণ করা সোজা! মানত করেছে বুড়ি। মানত না করলে সাধুর পাল্লায় পড়ে গেছে। সর্বস্ব যাবে। খায়ওনি। নরেন সাধু তুমি মানুষ! ঠাকুরের নামে দুদুমণিকে দণ্ডি খাটাচ্ছ, তোমার পাপ হবে না। গন্ধর্ব কবচ পেতে হলে দণ্ডি খাটতে হয়, বললেই হয়েছে! বিরজাসুন্দরী না খেয়ে, তাকে লুকিয়ে তবে সেই গন্ধর্ব

কবচ আনতে গেল। দুদুমণি তাকে নিয়ে কত অসহায় এটি ভাবতে গিয়ে তার দু-চোখ ভিজে গেল। যে যা বলছে, করে যাচ্ছে।

টুকুদি, নরেন সাধু জানোয়ার।

টুকু কী করবে বুঝে পাচ্ছে না। সে ভিতরে কেমন অস্থির হয়ে পড়ছে। সেখানে তার ছুটে যাবারও ক্ষমতা নেই। সাধুর থানে শনি মঙ্গলবারে পাঁঠা পড়ে। তিথি নক্ষত্র বুঝে লোকে হত্যে দেয়। যার যা মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বাজার পার হয়ে রাজবাড়ির রাশতলায় এখন সাধুর আশ্রম। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় লম্বা টিকি, টিকিতে জবাফুল বাঁধা। জরা ব্যাধি মৃত্যুর হাত থেকে মানুষ রেহাই পেতে চাইলে থানে যেতেই হয়। মানত করতে হয়।

সাধুর চেলা কালীপদই একদিন বারান্দায় বসে বলে গেছে, ঠাইনদি, সব গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানে হয়। টুকুর কুষ্ঠিটা দেবেন, বিচার করে দেখব।

কালীপদ আচার্য বামুন। গ্রহরাজ বলতে কথা। গাছের পাকা পেপে থেকে, কাঁঠালের দিনে কাঁঠাল, আমের দিনে আম সবই সে পায়। দাদু বেঁচে থাকতেও দেখেছে, কালীপদ এলে, ফল–মূল তার হাতে তুলে দিয়ে দাদু তৃপ্তি পেতেন। গ্রহরাজ সন্তুষ্ট থাকলে বাড়ির অমঙ্গল হয় না। কুষ্ঠি ঠিকুজিও সেই করে দেয়। বাড়িতে তার আগমন সব সময়ই শুভ সময়ের কথা বলে। তাকে নিয়ে আতান্তরে পড়ে গেছে বিরজাসুন্দরী সে ভালই জানে। সেই বলে গেছে বোধহয়, সাধুর কাছে যাবেন, বিধান মতো তাঁর কাজ করে দেখুন—ফল হাতে নাতে পাবেন।

ইদানীং টুকু দেখেছে, দুদুমণি, সূর্যস্তব পাঠ করছেন। সকালে উঠে সূর্যপ্রণাম। শেষে এই দণ্ডি খাটা। সে খেপে যাবে শুনলে—ভেবেই হয়তো লুকিয়ে চলে গেছে।

কী শরা।

একবার বড়ো মাসিকে খবরটা দিতে হয়।

এই শরা চলত আমার সঙ্গে।

কোথায় যাবে?

বড়োমাসিকে খবরটা দিই। দুদুমণির মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

নীলুমাসিকে এখন পাবে? স্কুল আছে না। স্কুল থেকে কি ফিরেছে।

সে বলল, কটা বাজে।

ঘড়িতে সময় দেখে বলল শরা, চারটা বেজে গেছে।

আকাশ মেঘলা বলে কটা বাজে বুঝতে পারছিল না টুকু। মাসি বাড়িতে এখনও ফেরেনি। মেসো ফিরতে পারে। মেশোর স্কুল বাড়ির কাছেই। খুব টিউশানি করে, এখন গরমের ছুটি বলে তাও নেই। মেসো বাড়ি থাকতেই পারে। তবে ক্লাবে গিয়ে বসে থাকলে মুশকিল। বোনটাও বাড়ি থাকলে এক্ষুনি চলে যেতে পারত। কলেজ হোস্টেলে থাকে বলে বাড়ি খালি পড়েই থাকে। কেউ না থাকলে, যা হয়, তালা দিয়ে যায় মাসি। মেসোর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে, তবে তার যে একদণ্ড আর এই বাড়িতে থাকতে

ইচ্ছে হচ্ছে না। এক্ষুনি ঘরের দরজায় শেকল তুলে তালা দিয়ে বের হয়ে পড়তে পারলে বাঁচে। ক্রোশখানেক রাস্তা সাইকেলে যেতে দশ বিশ মিনিট—কিন্তু গিয়ে যদি দেখে কেউ নেই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

মেসোদের দিকটাই পাকা রাস্তা, টাইম কলের জল, কারেন্ট সব আছে। পাকা বাড়ি একতলা। ছাদের সিঁড়ি করবে বলে ইট বালি সিমেন্ট তুলে রেখেছে। গরমের ছুটিতে সিঁড়িটা করে ফেলবে। বারান্দায় গ্রিল। উঠোনে ঢুকে ভিতরের বারান্দায় দিকটায় যাওয়া যায়। মেসো মাসি কেউ না ফিরলেও তার অসুবিধা হয় না। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত ঢোকালেই সদর দরজার চাবি।

মাসিই বলেছে, আমরা না থাকলেও অসুবিধা নেই। কোথায় চাবিটা থাকে দেখিয়ে দিয়েছে। দুদুমণির কত খবর থাকে, এবেলা ওবেলা তাকে মাসির বাড়ি যেতেই হয়। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেই সবার চোখ তার ওপর। টুকু এসেছে আবার। ঠিক বিরজাসুন্দরী মেয়ের কাছে খবর পাঠিয়েছে, টুকুর পাত্রের একটি খোঁজ পাওয়া গেছে। প্রতিবেশীরা জানালা খুলে তাকে দেখলেই টুকুর গা জ্বালা হয়। আজকাল সে চোরের মতো সবার আড়ালে মাসির বাড়ি ঢুকে যায়—সাঁজ লাগলে চুপিচুপি বের হয়ে আসে। সিঁড়ির মালমশলাতে উঠোন ভরতি—সে শত চেষ্টা করলেও চাবিটার নাগাল পাবে না। সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু আজ সে মরিয়া।

এই শরা চল আমার সঙ্গে।

টুকু ঘরে ঢুকে শাড়ি সায়া পাল্টে নিল। মুখে সামান্য প্রসাধন করল। তারপর দরজা টেনে শেকল তুলে তালা লাগিয়ে দিল।

তকে বের হতে দেখে নধর কোথা থেকে হাজির।

সঙ্গে যাবে।

কারও যেতে হবে না। মনে মনে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে গজ গজ করছে টুকু। তাছাড়া খালি বাড়ি রেখে সে যেতেও পারে না। শরাকে পাঠাতে পারত, খবর দিয়ে আয়, দুদুমণি নরেন সাধুর থানে গণ্ডি খাটছে। খবর পেলে মাসি নিজেও ছুটে আসতে পারে। মাসকাবারি রিকশাওয়ালাকে খবর দিলেই হল, রিকশায় চড়ে মেসো না হয় মাসি চলে আসতে পারে। কিন্তু সে একটা কিছু করতে চায়। শরাকে দিয়ে খবর পাঠালে আর দশদিনের মতোই তার প্রতিবাদের কোনো গুরুত্ব থাকবে না। মাসি এসে বলতেই পারে, মা কী করবে! দাদারা মাথা পাতছে না— বড়দা লিখবে, আমার সময় কোথায়, টাকা পয়সা যা লাগে জানাবে। তোর মেসোই বা কী করবে। তারই বা সময় কোথায়। কত সম্বন্ধ এল, দানবের মতো দাবি দাওয়া সব। কে মেটাবে অত খাই।

এ-সব কথা শুনলে টুকুর যে মাথা হেঁট হয়ে যায় কেউ বোঝে না। কোনো কথাই আর তার শুনতে ভালো লাগে না।

টুকু বলল, এই শরা চল। তোর নীলুমাসিকে খবরটা দিতে হবে। আমরা সাইকেলে যাব আর আসব।

সাইকেলে! আমার তো সাইকেল নেই।

তোর সাইকেল না থাকলেও চলবে। তুই না হয় আমি রডে বসব।

তোমার নিন্দামন্দ হবে টুকুদি।

হোক। আমার আর নিন্দামন্দের বাকি আছে কি। মাসিকে খবরটা দিই। নাতনির জন্য বুড়ি নরেন সাধুর থানে দণ্ডি খাটছে। বুড়ি মরবে। আমি কেন মরার ভাগী হতে যাব।

শরাকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছে। টুকুদি রডে বসবে না সে বসবে বুঝতে পারছে না। যেই বসুক লোকেরা চোখ টাটাবে।

টুকুদি আমাকে না নিয়ে গেলে হয় না।

না হয় না।

এই অবেলায় বের হবে? আমাকে নিয়ে বের হলে যে লোকে তোমারও মাথাটি খারাপ ভাববে। তোমার নিন্দামন্দ হবে। লোকে কুকথা বলবে।

তুই যাবি, না বকবক করবি।

শরা আর কী করে। টুকুদির চুলের গন্ধ পাবে রডে বসলে। এই লোভেই যেন সে সাইকেলে চেপে বসল। টুকু রডে বসে বলল, বড়ো সড়কের দিকে চল।

ওদিকটায় তো ফাঁকা। ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। মাসির বাড়ি যাবে না!

টুকু খেপে যাচ্ছে।

তুই কি আমার গার্জিয়ান। নাম।

শরা ভয়ে ভয়ে সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ল। রাস্তায় লোকজন তাকে দেখছে। কাউকে সে গ্রাহ্য করছে না।

চৌধুরীমামা আড়তে যাচ্ছেন, তাকে দেখেই বলল, টুকু না?

টুকু বলল, বড়ো সড়কে যাচ্ছি।

শরা ঘাবড়ে গেল। টুকুদির মামারা জানতে পারলে তাকে লাঠিপেটা করতে পারে। এতো বড়ো আস্পর্ধা, টুকুকে সাইকেলের রডে বসিয়ে কলোনি ঘোরা হচ্ছে। এত সাহস হয় কী করে। অথচ টুকুদির কথা সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। সে হতাশ গলায় বলল, টুকুদি বাড়ি চল। মাথা গরম কর না। আমি না হয় মাসিকে খবরটা দিয়ে আসছি।

টুকু সাইকেলে চেপে শুধু বলল, রডে বোস। কোনো কথা না। দশ ভাতারের খোঁজে যাচ্ছি। এক ভাতার নিয়ে আমার পেট ভরবে না। বুঝতে চেষ্টা কর।

মেজাজ টুকুদির খুবই অপ্রসন্ন। এতেক খারাপ কথা টুকুদি কখনো বলে না। কী সুন্দর স্বভাব টুকুদির। আর সেই কিনা বলছে, দশ ভাতারের খোঁজে যাচ্ছি। তার যেন এ-বড়ো অচেনা টুকুদি। দুদুমণি দণ্ডি খাটতে না গেলেই পারত। এমন সুন্দর মেয়ের বর জুটছে না, খোঁড়া বলে কী তার কোনো মূল্য নেই। দুদুমণি বাজিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র, টুকুদির পাত্র

জুটছে না। টুকুদি যে বলল, গাছের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। সবকিছুই বড়ো রহস্যজনক ঠেকছে।

টুকু কলোনির ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। টুকুকে সবাই চেনে—কুমুদ মজুমদারের নাতনি, পা খোঁড়া মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না। স্কুলের মাঠ পার হয়ে তেলিপাড়ায় আসতেই শরা বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও, মাসিকে খবরটা দিয়ে আসছি।

না। কোনো খবর দিতে হবে না।

টুকু সোজা বড়ো সড়কের দিকে উঠে গেল। তারপর সাইকেল থেকে নেমে কিছুটা ঘোরের মধ্যে যেন হেঁটে গেল।

শরা সাইকেল নিয়ে টুকুদিকে অনুসরণ করছে।

একবার না পেরে বলল, তোমার কী হয়েছে টুকুদি।

এই যে ছোটো জায়গাটা দেখছিস, দাদু আমার নামে দিয়ে গেছে। এখানটায় কিছু একটা করতে হবে। এই একটা চা-এর দোকান টোকান। বাস স্ট্যান্ড, সারের গুদাম, সরকারি কোয়ার্টার কত কিছু হচ্ছে। রাস্তার ধারে তুই আমি মিলে কিছু একটা করতে চাই। এক ভাতারের হাত থেকে তো বাঁচি! দশ ভারি হয়ে বেঁচে থাকাও অনেক গৌরবের। চা-এর নেশার চেয়ে আমার নেশা নাকি মানুষের বেশি! দেখি না দোকান করে। জলে ডুবে যাচ্ছি। তুই না হয় আমার খড়কুটো হয়েই থাক। কি পারবি? রাজি। টুকু প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁপাতে থাকল।

তোমার কোন কথাটা আমি রাখিনি টুকুদি। কিন্তু তোমার গাছটা রাগ করবে না?

গাছ! টুকু হা হা করে হাসল।–তুই রাজি কি না বল।

বললে যে গাছের সঙ্গে তোমার বে হয়ে গেছে।

বোকা কোথাকার। গাছ কখনো রাগ করে। না সে রাগ করতে জানে। তুই রাজি আছিস কি না বল। তুই রাজি থাকলে গাছটা মাটিতে লেগে যাবে মনে হয়।

তখন সারা আকাশ ম্লান অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে সহসা রূপালি বন্যায় ভেসে গেল। আবিষ্কারের মতো মনে হল—গাছটা লেগে যাবে। জীবনে সামান্য সূর্যালোক। এইটুকুই টুকুর আজ বড় বেশি দরকার। জমিটায় সে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল। জমিটা তার নিজের, নিজস্ব। চা-এর দোকান, মানুষজন, ভিড় এবং ব্যস্ততা —এক টুকরো স্বপ্ন। শুরা না এলে এই স্বপ্নটুকু যেন খুঁজে পেত না।

টুকুদি ওঠো। দুটো একটা তারা ফুটছে। চল মাসির বাড়ি হয়ে যাই।

তুই বোস আমার পাশে। আমার কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করছে না। ঘাস থেকে দুটো একটা ফুল তুলে খোপায় গুঁজে দিতে থাকল টুকু।